আলো পথ
এমএলই নিউজলেটার
জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫, সপ্তম সংখ্যা

পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর সম্মেলন কক্ষে 'পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, এনডিসি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ সিরাজুল হক খান, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিরিন আখতার। সেমিনারে মূল আলোচনাপত্র উপস্থাপন করেন নৃবিজ্ঞানী ও গবেষক অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন ও সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ।

এনসিটিবি-এর সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল ও প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোঃ ফাইজুল কবির ও উপ-সচিব নুজহাত ইয়াসমিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দুই উপ-সচিব সুদত্ত চাকমা ও লিপিকা ভদ্র, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মোঃ বেলায়েত হোসেন, প্রফেসর ড. ছিদ্দিকুর রহমান, প্রফেসর শফি আহমেদ, প্রফেসর মেজবাহ কামাল, প্রফেসর সৌরভ সিকদার, মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা, বাঁধন আরেং, বঙ্গপাল সরদার, আলবার্ট মানকিন-সহ সেমিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলের আদিবাসী প্রতিনিধি, শিক্ষা গবেষক, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা এবং আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে নিবেদিত সংস্থার প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে বক্তাগণ এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির সঠিক প্রতিফলনের দাবি জানান। আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির যথাযথ চিত্রায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ রচনার কাজে আদিবাসী লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও তারা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। বক্তাগণ বলেন, এ বিষয়ক সার্বিক কর্মকাণ্ড যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব এনসিটিবি'র ওপরই বর্তায় এবং ইতোমধ্যে এসব বিষয়ে নানা উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। আমরা সবাই এনসিটিবি'র এই প্রয়াসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি।

এ সেমিনারের প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, এনডিসি বলেন, পাঠ্যপুস্তক যাতে একীভূত (inclusive) হয় ও দেশের সকল মানুষের সংস্কৃতি যথাযথভাবে তুলে ধরা হয় সে প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক পড়ে যাতে কোনো শ্রেণি বা সম্প্রদায় মানসিকভাবে আহত না হন, সেদিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়নে অব্যাহতভাবে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের আহ্বান জানান। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও গণসাক্ষরতা অভিযান যথাযথ সহায়তা দিয়ে যাবে বলেও তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আবু রেজা

পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা

৩০ ডিসেম্বর ২০১৪,আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সম্মেলন কক্ষ

সুপারিশমালা

'পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতিভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা প্রণীত হয়।

- বাংলাদেশের সংবিধানে ঘোষিত মানবাধিকার এবং শিক্ষানীতি ২০১০-এর অঙ্গীকার অনুসারে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য বাঙালি ও আদিবাসীদের সমান্তরালভাবে চিত্রিত করতে হবে। (৫ম শ্রেণির *আমার বাংলা বই*-এ পৃষ্ঠা ১ ও ২-এ বাঙালি ও আদিবাসীদের ভিন্ন জাতির মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, 'বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাঙালি' বলা হয়েছে। পৃষ্ঠা ৫-এ বিপরীত শব্দ হিসাবে দেওয়া হয়েছে বাঙালি-অবাঙালি, সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘিষ্ঠ, বন্ধু-শত্রু ইত্যাদি। এসবের মাধ্যমে মানসিকভাবে বাঙালি ও আদিবাসীদের পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।)
- মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের অবদান যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে। (৫ম শ্রেণির *আমার বাংলা বই* ২০১২, পৃষ্ঠা ২৯-এ বলা হয়েছে, 'অন্যান্য বাঙালির মতো তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন।'এখানে বাঙালি ছাড়া অন্য জাতির মানুষেরাও যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, সেই স্বীকৃতি নেই।)
- আদিবাসীদের ভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় পূর্ণাঙ্গ ধারণা উপস্থাপন করতে হবে এবং বাংলার সঙ্গে আদিবাসী ভাষাগুলোর যোগসূত্র সম্পর্কে আলোকপাত করতে হবে। (৬ষ্ঠ শ্রেণির *ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি* বইয়ে পৃষ্ঠা ২৫-এ 'ভাষা পরিবার'-এর ধারণা খণ্ডিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং বাংলার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার যোগসূত্র সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোকপাত করা হয়নি।)
- আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত পাঠ্যবিষয়ে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত উপস্থাপনার বদলে সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত ও আন্তঃসম্পর্কসমূহ আরো স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যাগুরু হিসেবে উল্লেখ না করে সবাইকে সমান মর্যাদাপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে হবে। (৫ম শ্রেণির *আমার বাংলা বই*-এ পৃষ্ঠা ২-এ 'বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ বাঙালি' বলা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির *Bangladesh and Global Studies* বইয়ের পৃষ্ঠা নং ৬-১০ ও Preface অংশে পাঠ্যবিষয় এরূপভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।)
- আদিবাসী সম্পর্কিত পাঠ্যবিষয় উপস্থাপনে শব্দচয়ন, নামের বানান, বিবরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক বেশি সংবেদনশীল ও মনোযোগী হতে হবে। (চতুর্থ শ্রেণির *Bangladesh and Global Studies* বইয়ে ভুল বানানে আদিবাসীদের নাম উপস্থাপন করা হয়েছে।)
- পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির যথাযথ চিত্রায়নের লক্ষ্যে আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ রচনার কাজে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের লেখক, পর্যালোচক, বিশেষজ্ঞ ও আদিবাসী প্রতিনিধি সম্মিলিতভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসীদের বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন কোনো জাতি হিসেবে দেখানোর পরিবর্তে আদিবাসীরাও বাংলাদেশের নাগরিক এমনভাবে পাঠ্যবিষয়ে উপস্থাপন করতে হবে। (৫ম শ্রেণির *আমার বাংলা বই*-এ পৃষ্ঠা ১ ও ২-এ বাঙালি ও আদিবাসীদের ভিন্ন জাতির মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।)
- আদিবাসীদের জীবন সম্পর্কে পাঠ্যবিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এ লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের লেখকদের সচেতন ও সংবেদনশীলতা উন্নয়নের উদ্যোগ নিতে হবে, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বাংলাদেশের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকে কাউকে হেয় না করে সকলের বৈচিত্র্যময় জাতিগত সংস্কৃতি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
- বাংলাদেশের সকল আদিবাসী শিশুকে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য একটি 'ভাষানীতি' প্রণয়ন করতে হবে।
- শুধুই মাতৃভাষা শিক্ষা নয়, আদিবাসীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য ভাষাভিত্তিক শিক্ষাপরিকল্পনা (Language based Education Plan) করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন আদিবাসী সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট আদিবাসী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত যাচাই-বাছাই করে পাঠ্যপুস্তকের শিখন বিষয় চূড়ান্ত করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে প্রতিবন্ধী বা অন্য কোনো গ্রুপের সঙ্গে আদিবাসীদের সংযুক্ত করে উপস্থাপন করার পরিবর্তে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে।
- জানুয়ারি ২০১৫ থেকে নির্দিষ্ট ৫টি আদিবাসী ভাষায় বই প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও এ সময় থেকে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় বই পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়ের উদ্যোগ নিতে হবে।
- আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে, পাঠ্যপুস্তকে এ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি সিলেট রেডিওতে মণিপুরী ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠান অনুসরণে পর্যায়ক্রমে সকল আদিবাসী ভাষায় রেডিও অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' কথাটির পরিবর্তে পাঠ্যপুস্তকে 'আদিবাসী' হিসাবে পরিচিতি উপস্থাপনার বিষয়টি সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

আবু রেজা

এমএলই উপকরণ প্রণয়নের কাজ শুরু করায় সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন

১২ মার্চ ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই) ফোরামের ৩১তম সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডা. গোলাম মোস্তফা। সভায় সকলের পরিচয়পর্ব শেষে গত সভা অর্থাৎ ৩০তম সভার প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর প্রকল্প পরিচালক মেহেরুন নাহার স্বপ্না, ইউনেস্কো থেকে মাহফুজা রহমান, ব্র্যাক-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার তপন আচার্য, আরডিসি-এর মেরিনা আক্তার, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক গোলাম মোস্তফা দুলাল, এফআইভিডিবি থেকে কুমার প্রীতীশ বল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমএলই শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ৫টি ভাষার (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি) লেখকদলের সদস্যবৃন্দ।

সভার শুরুতে তপন কুমার দাশ ৮-১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালা আয়োজনের প্রেক্ষাপট সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এনসিটিবি ও সরকারের সাথে অনেক মিটিং করার পর গত মাসে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ মার্চ ২০১৫ থেকে শুরু হলো এমএলই উপকরণ উন্নয়নের কাজ। এ উপলক্ষে ৮-১২ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে লেখক কর্ম-শিবির। এখন সকলের উচিত হবে, নিজেদের মধ্যে কোনোরূপ বিভেদ তৈরি না করে কাজটি যেন দ্রুত শেষ করা যায় সেই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া। তিনি আরো বলেন, আগামী ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে প্রতিটি শিশু যেন এই উপকরণগুলো পেতে পারে সেই লক্ষ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

আদিবাসী ভাষার শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে অধ্যাপক সৌরভ সিকদার বলেন, কতজন আদিবাসী শিক্ষক লাগবে তার চাহিদা নিরূপণ করতে হবে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কতজন শিক্ষক রয়েছেন এবং কতজন শিক্ষককে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন এইসব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, বই তৈরির পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্যও কাজ করতে হবে। এর জন্য কমিটি তৈরি করে কাজটি করতে হবে, যে সকল স্কুলে বিভিন্ন ভাষার শিক্ষার্থী রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কীভাবে কাজটি করা হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

সবশেষে এমএলই উপকরণ প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভার পক্ষ থেকে সরকার এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সোবহানা আলম

মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার - মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে 'আদিবাসীদের মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা' শীর্ষক এক সেমিনার এবং গণসাক্ষরতা অভিযান প্রকাশিত এমএলই নিউজলেটার *'পহর'* এবং *'নিজভূমে পরবাসী: বাংলাদেশের আদিবাসী'* শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান বিএমএ অডিটোরিয়াম, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর শফি আহমেদ। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক গোলাম মোস্তফা দুলাল এবং নর্দান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক ভিক্টর লাকড়া। এই সেমিনার আয়োজন করে গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC) ও সহযোগিতা করে গণসাক্ষরতা অভিযান। অনুষ্ঠানে *'পহর'* এবং *'নিজভূমে পরবাসী : বাংলাদেশের আদিবাসী'* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি। উল্লেখ্য, বইটির সম্পাদক প্রফেসর শফি আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশেদা কে. চৌধূরী, নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান।

সেমিনারে দুইটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার উল্লেখ করেন, পিছিয়ে পড়া আদিবাসী শিশুরা যেমন স্কুলে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না, তেমনি যারা স্কুলে যেতে পারছে তারা তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ে অনেক আদিবাসী শিক্ষার্থী।

RDC-এর চেয়ারপার্সন প্রফেসর মেসবাহ কামাল প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও বহু ভাষার ও বহু জাতির মানুষ আছে, বাঙালিদের যেমন মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার আছে তেমনি আদিবাসীদেরও মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার রয়েছে।

মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, 'আদিবাসীদের মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে আমি একমত এবং এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোনো দ্বিমত নেই। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও অধিকারের পক্ষে আইন আছে, সংবিধান আছে, ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি আছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ তাদের সাংবিধানিক অধিকার। শিক্ষানীতিতেও এই অধিকারের উল্লেখ আছে। মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এখন বাকি কাজগুলোকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

মেরিনা আক্তার

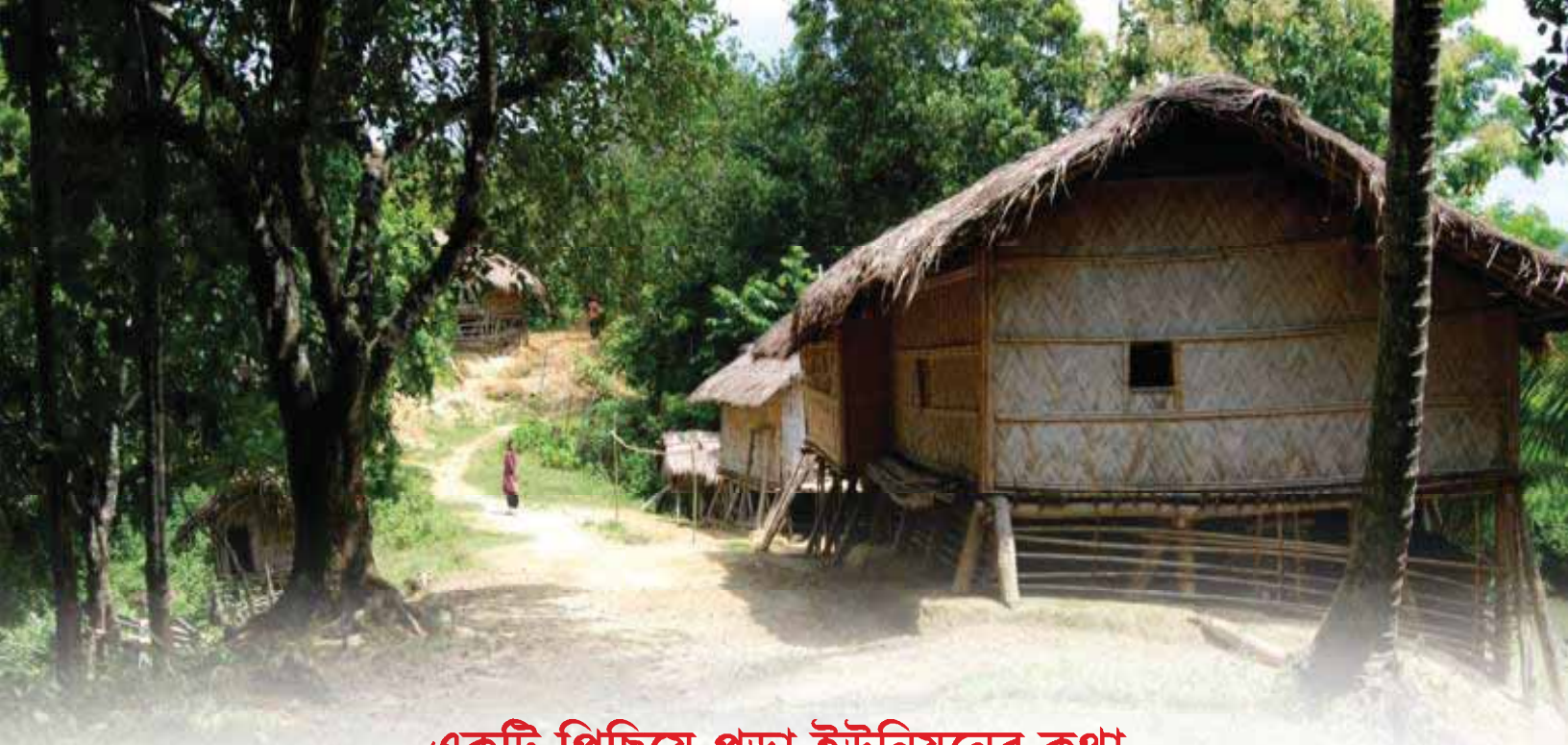

একটি পিছিয়ে পড়া ইউনিয়নের কথা

ইউনিয়নটির নাম দুমদুম্যা। এটি রাঙামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের মধ্যে একটি। আয়তন ১২২ বর্গমাইল। এই ইউনিয়নে রয়েছে মোট ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাটবাজার রয়েছে ১টি, কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। শিক্ষার হার ৭.৭৭% এবং মোট লোক সংখ্যা ৫,৫৭৫ জন।

শিক্ষার কথা বলতে গেলে তো অবাক হওয়ার কথা। কারণ, ভোটার ফরম পূরণের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতা জিজ্ঞেস করলে এরা হেসেই বলে ডাবল এম. এ.। তার মানে একেবারেই লেখাপড়া করেনি। আমরা কয়েকজন বৃদ্ধ পুরুষ এবং মহিলাকে পেয়েছি যারা পাকিস্তান আমলে কিছু লেখাপড়া করেছে। এরাও কোনো রকমে স্বাক্ষর করতে পারেন মাত্র। আর নতুন প্রজন্মের কথা নাই বা লিখলাম। আমরা কয়েকটা গ্রাম মন্দিরাছড়া, আদেয়াবছড়া, নোয়াপাড়া, বর্গাখালী, মোনপাড়া ঘুরেছি। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হলো, এই এলাকার ছেলেমেয়েরা কেউ লেখাপড়া করে না। কারণটা জিজ্ঞেস করেছিলাম এলাকার এক কার্বারীকে। তিনি বললেন, এসব এলাকায় কোনো প্রাইমারি স্কুল নেই। এখানে কোনো এনজিও'র এ ধরনের কার্যক্রম নেই। গণ্ডাছাড়া পাংখো পাড়ায় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যেটি কিনা এইসব এলাকা থেকে ৮/৯ ঘণ্টা হেঁটে যাওয়ার পথ। তাহলে কি এসব এলাকার ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে? নিরক্ষর থেকে যাবে কি এরা বছরের পর বছর? বিষয়টির প্রতি আমাদের সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দেশের এই বিরাট অংশ যদি নিরক্ষর থেকে যায়, সমষ্টিগতভাবে আমরাও পিছিয়ে পড়ব, সে জন্য প্রয়োজন আশু জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ।

পুষ্টি, ভিটামিন, টিকা তারা পাচ্ছে না। নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে এসব এলাকার নিষ্পাপ শিশুরা মারা যাচ্ছে অকালে। মন্দিরাছড়ায় আমি কয়েকটি শিশুকে দেখেছি মাচাং ঘরের নিচে ময়লা নিয়ে খেলছে। সেখানে শূকরের মল পড়ে আছে চারদিকে। এদের অধিকাংশ পেট মোটা, হাত-পা চিকন, পেটানো শরীর। মনে হয়েছে কৃমি দ্বারা আক্রান্ত। আমাদের সঙ্গে একজন স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই এলাকায় টিকা দেওয়া হয় কিনা? তিনি বললেন, ওষুধের মান ধরে রাখার জন্য ভ্যাকসিন বাক্সের ক্ষমতা মাত্র ২৪ ঘণ্টা আর এখানে পৌঁছাতে সময় লাগে ৭২ ঘণ্টা, এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ওষুধের মান বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাহলে এরা কি রোগেশোকে মারা যাবে প্রতিনিয়ত? কখনো পাবে না সরকারের দেওয়া সুবিধাগুলো?

স্থানীয় বৈদ্যরা হচ্ছেন ঐসব এলাকার চিকিৎসা সেবার আশা-ভরসা। যদি কোনো রকমের চিকিৎসায় ব্যর্থ হন তাহলে তাদের আর কিছু করার থাকে না। যেখানে রাস্তা নেই, স্কুল নেই, সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা ভাবা যায় না। এমনকি স্বাস্থ্যকর্মীরাও সেখানে যেতে পারেন না শুধু যোগাযোগের সমস্যার কারণে। এখানে এরা বেঁচে আছে ভগবানের অশেষ কৃপায়। ভগবানই এদের চিকিৎসক। এখানকার ইউনিয়নের একজন ওয়ার্ড মেম্বার খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন, চিকিৎসার অভাবে তার দুটি পুত্র সন্তান কয়েক বছরের ব্যবধানে মারা যায়। কোনো রোগীকে যদি চিকিৎসা করাতে চায়, তাহলে তাদের উপজেলা সদরে আসতে হয়, যা কিনা তিন দিনের পথ। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, পুরো উপজেলাতে মাত্র দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র; একটি সদর উপজেলায়, অন্যটি বনযোগীছড়াতে। বাকি দুটি ইউনিয়নে (মৈদুং ও দুমদুম্যা) কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা বছরের পর বছর চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে।

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তারা কতটুকু সমস্যায় জর্জরিত, অবহেলিত, বঞ্চিত। এজন্য আমি এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাব- আসুন, আমরা তাদের পাশে দাঁড়াই তাদের মানুষের মতো মানুষ হিসেবে বাঁচতে দিই, নিষ্পাপ শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে দিই, নিরক্ষরতামুক্ত করি। এরা শিক্ষিত হলে, সমৃদ্ধ হলে দেশের ও দশের জন্য এরাও হতে পারে মূল্যবান সম্পদ।

নির্মল কান্তি চাকমা

উরাঁও ভাষা

উরাঁও পারাব : কারাম

উরাঁও সমাজকের পার্বণিক পারাব মূলত চারটা: ফাগুয়া ও সারহুল, কারাম, সোহরায়।

কারাম

কারাম পারাব সম্পন্ন হওয়েলা ভাদ্র-একাদশী, পূর্ণিমা ও দশমীনে। কারাম পারাবকের মানে গাছকের পূজা লাগুন পারাব। এই পারাবকে কেন্দ্র কারকে সামাজকের ছুয়াপুতা ছোঁড়া/ছুঁড়ি হইকে ওঠায়না নাচনে বিভর, গীতনে মুখর, পিয়াসমে মত্ত। বিশেষক্যারকে ছোঁড়া/ছুঁড়ি মানকের জিউনে তাখান সৃষ্টি হয়েলা অনেক হাউস লেওয়েক আচ্ছা পরিবেশ। এ পারাব আসরে উরাঁও ছোঁড়া/ছুঁড়ি মানকের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশকের পারাব।

কারাম কাথনী

ধারমা এবং কারমা নামে দুই ভাই রেহে। কারমা খেতনে কামকারেলা অন্যদানে ধারমা কারামপূজা লেইকে ব্যস্ত রাহেলা। একদিন ধারমা কারাম পূজা কারকে নাচ গীতনে এমনি বেতাল হই গেলা হায়, সে ঘুরকে আয়কে কারমা ধারমাকের এসেন ব্যবহারে রাগাইকে উঠলেই এবং কারাম গাছকের ড্যাহারাগুলাকে রাগকারকে পানিনে ফেগ দেলেই। কিন্তু সেকের পর সে কারমাকের মনে মনে শুরু হলেই জিউকের জালা। উ কোন টানে শান্তি নাই পাওয়াথে।

বাধ্য হইকে ধারমা দুই ভাই এক সাঙ্গে মিলকে কারাম গাছকে খোজকে নিকলাক লাগুন ঘারসে বেহের গেলান। সেমান নাদীকের পাড় ধারকে সাত দিন না খায়কে নাই নিদায়কে চালতে হান। ভূক পিয়াসনে কাহিল হইকে দুই ভাই নাদিকের পানিনে ন্যামকে পানি পিয়েক চেষ্টা কারলান। কিন্তু সেমানকের ভাগ্যে পানি পিয়েক নাই হলেই। কারণ, দেখাল গেলেই পানিনে খালি পোকা আর পোকা। বাধ্য হইকে সেমান আবার চালে লাগলান নাদিকের ধ্যার ধ্যার। আরো সাত দিন সাত রাত যাওয়াল পর সেমান আগুদানে দেখে পালান একটা কোর গাছ।

মেল্লা কোর প্যাক হায় গাছনে। সেমান খুব আগ্রহসে মেল্লা গুলা পাকাল কোর পাড়লান এবং খায়েক চেষ্টা কারলান কিন্তু না, ইঠনাও সেমানকের ভাগ্যনে ফল খাক সৌভাগ্য নাই হলেই। দেখাল গেলেই সব কোরনে খালি পোকা আর পোকা। আবার সেমান ভূক পিয়াসে কাহিল হইকে কারাম গাছকের ড্যাহারাকের খোজে আগুদানে যায় লাগলান। ক্যাট গেলেই আরো সাত দিন সাত রাত। হঠাৎ আগুদানে দেখে পালান কারাম গাছকের ড্যাহারা ভ্যাসকে যাথে। তাখান সেমান পানিনে নামহ্লান এবং ড্যাহারা গুলাকে লেইকে ঘারদানে যায় লাগলান। ঘার যায়কে দেখলান সভেমান সেমানকের লাগুন বেকুল হইকে হান।

দুই ভাই সেমানকে সান্ত্বনা দেলান এবং সভেমান কারাম গাছকের ড্যাহারা সেবায় নিয়োজিত হলান। তাখান সে শুরু হলেই কারাম গাছকের পূজা।

বৈদ্যনাথ টপ্য

বাংলা ভাষা

উরাঁও পার্বণ : কারাম

উরাঁও সমাজের পার্বণিক উৎসব মূলত চারটি। যেমন- ফাগুয়া, সারহুল, কারাম ও সোহরায়।

কারাম

কারাম উৎসবটি পালন করা হয় ভাদ্র-একাদশী, পূর্ণিমা ও দশমীতে। কারাম পর্বের অর্থ 'বৃক্ষের পূজা উপলক্ষে উৎসব'। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে উরাঁও সমাজের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী হয়ে ওঠে নৃত্য-চঞ্চল, সংগীতমুখর, পানাহারে মত্ত। বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের হৃদয়ে তখন সৃষ্টি হয় অনাবিল আনন্দ উপভোগের পরিবেশ। এ পর্ব প্রকৃতপক্ষে উরাঁও যুবক-যুবর্তীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা প্রকাশের পর্ব।

কারামের কাহিনী

ধারমা এবং কারমা নামে দুই ভাই ছিল। কারমা মাঠে কাজ করে, আর ধারমা কারাম পূজা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। একদিন ধারমা কারাম পূজা করে নৃত্য-গীতে এমনি বিভোর হয়ে পড়ে, মাঠ থেকে ফিরে এসে কারমা ধারমার আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কারাম বৃক্ষের শাখাগুলো রাগ করে পানিতে নিক্ষেপ করে। কিন্তু এরপর থেকে কারমার হৃদয়ে শুরু হয় ভাব উন্মাদনা। সে কোনো কিছুতেই মনে শান্তি পায় না।

বাধ্য হয়ে ধারমা এবং কারমা দুই ভাই একত্রে মিলে কারাম বৃক্ষ উদ্ধারের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারা নদীর পাড় ধরে সাত দিন অনাহারে অনিদ্রায় পথ চলতে থাকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে দুই ভাই এক নদীতে নেমে জল পান করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের পক্ষে জল পান করা সম্ভব হয় না। কারণ, দেখা যায় জলে শুধু পোকা আর পোকা।

আবার তারা হাঁটতে থাকে নদীর ধার দিয়ে। আরো সাত দিন সাত রাত চলার পর তারা দেখতে পায় একটা কুলগাছ। অসংখ্য কুল পেকে আছে গাছে। তারা অধীর আগ্রহে অনেক পাকা কুল সংগ্রহ করে ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করে। কিন্তু না, এখানেও তাদের ফল খাওয়ার সৌভাগ্য হয় না। দেখা যায়, প্রতিটি কুলেই শুধু পোকা আর পোকা। আবার তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে কারাম বৃক্ষের শাখার সন্ধানে সামনের দিকে এগুতে থাকে।

কেটে যায় আরো সাত দিন সাত রাত। হঠাৎ সামনে দেখতে পায় কারাম বৃক্ষের শাখা ভেসে যাচ্ছে। তখন তারা পানিতে নামে এবং শাখাগুলো নিয়ে বাড়ির দিকে যাত্রা করে। বাড়িতে ফিরে তারা দেখল সবাই তাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।

দুই ভাই তাদের সান্ত্বনা দেয়। তারপর সকলে মিলে কারাম বৃক্ষের সেবায় নিয়োজিত হয়। সেই থেকেই শুরু হয় কারাম বৃক্ষের আরাধনা।

নীরেন উরাঁও

মণিপুরী লিপি কাহিনী

মণিপুরী ভাষার নিজস্ব লিপিপদ্ধতি আছে। 'মৈতৈ ময়েক' নামে পরিচিত এই মণিপুরী লিপি কখন থেকে প্রচলিত হয়েছে বা কোন উৎস থেকে জাত হয়েছে, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। কারো কারো মতে, ৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মণিপুরে রাজত্বকারী মহারাজ পাখংবা প্রথম এই লিপির উদ্ভাবন করেন। তখন এর সংখ্যা ছিল ১৮টি; পরবর্তী কালে উচ্চারণকে আরো প্রমিত করার লক্ষ্যে আরও ৯টি বর্ণ যুক্ত করা হয়। আবার কেউ কেউ এই লিপির উদ্ভাবনকাল সপ্তদশ শতাব্দী বলে মনে করেন। ড. কালিদাস নাগ মণিপুরী লিপিকে সম্রাট অশোকের পূর্ববর্তী সময়ের বলে দাবি করেন। এ ব্যাপারে তার যুক্তি হলো, পাটনা জাদুঘরে অশোক-পূর্ব সময়ের যে সব প্রস্তরলিপি রক্ষিত আছে, সেখানে ব্যবহৃত লিপির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মণিপুরী লিপির মিল আছে।

আমরা জানি, প্রাচীনকালে বর্তমান মণিপুর এক এবং অখণ্ড রাজ্য ছিল না। মোইরাং অঞ্চলে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা হতো সেই প্রাচীনকাল থেকেই। মণিপুর উপত্যকায় পঞ্জিকা বা দিনপঞ্জিকার উদ্ভাবন ও ব্যবহার শুরু হয় প্রথম। এই অঞ্চলেই জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা হতো সেই প্রাচীনকাল থেকেই। মণিপুর উপত্যকায় পঞ্জিকা বা দিনপঞ্জিকার উদ্ভাবন ও ব্যবহার শুরু হয় প্রথম এই অঞ্চলেই। কমপক্ষে একাদশ শতাব্দী থেকে প্রাচীন মোইরাং রাজ্যে একটি বিজ্ঞানসম্মত পঞ্জিকা প্রণয়ন ও ব্যবহারের ইতিহাস আমরা পাই। মোইরাং অঞ্চলের একজন শাসক 'মালিয়া ফম্বালচা'র নামে একটি বর্ষ গণনারীতি এখনও মণিপুরে প্রচলিত, যে হিসাব অনুযায়ী এখন ৩৪১২ বর্ষ চলছে। তবে কখন কীভাবে এই বর্ষ গণনারীতি চালু হয়েছিল তা ইতিহাসের আলো-আঁধারির ছায়াচ্ছন্নতায় ঢাকা।

এসব নানা কারণে কমপক্ষে দুইশত খ্রিষ্টপূর্বাব্দেই মোইরাং অঞ্চলের সঙ্গে মৌর্য সভ্যতার একটি যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। আর তখন থেকেই ব্রাহ্মীলিপির অনুকরণে একটি লিপির সৃষ্টি করে এই অঞ্চলে লেখালেখির সূচনা হয় বলে ইতিহাসবিদরা অনুমান করে থাকেন। তাছাড়া তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত বলে বিবেচিত 'পোইরৈতোন খুনথোকপা' নামের একটি গ্রন্থের কথা আমরা জানি; মণিপুরী লিপিতে লিখিত ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজা খোঙতেকচার আমলের তাম্রলিপির কথাও আমরা জানি। তাই বলা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব দুইশত অব্দে বা প্রথম শতাব্দী থেকে না হলেও মণিপুর অঞ্চলে অন্তত তৃতীয় শতাব্দী থেকে মণিপুরী লিপির জন্ম এবং লেখালেখির সূত্রপাত হয়েছে। তবে মণিপুরের বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত লিপির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এতে বোঝা যায়, সমগ্র মণিপুর অঞ্চলে একই সঙ্গে একই ধরনের লিপির ব্যবহার করে লেখালেখির সূত্রপাত ঘটেনি। মণিপুরে আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত মণিপুরী লিপিতে রচিত প্রায় এক হাজারেরও বেশি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনায় বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে প্রান্তসময় থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য পর্যায় পর্যন্ত মণিপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন মহারাজ খাগেম্বা (১৫৯৭-১৬৫২)। ততদিনে প্রায় সমগ্র মণিপুর অঞ্চল একীভূত হয়ে এক রাজ্যে পরিণত হয়েছে। অঞ্চলভেদে প্রচলিত লিপির ভিন্নতা রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করতো বিধায় রাজা খাগেম্বা সব লিপি মিলিয়ে সব অঞ্চলের জন্য একটি সাধারণ লিপিপদ্ধতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই তিনি রাজ্যের বিভিন্ন পণ্ডিতদের সহায়তায় সর্বজনীন একটি লিপিপদ্ধতি প্রণয়ন করেন; যেখানে মূল লিপি ১৮টির সঙ্গে উচ্চারণকে অধিকতর প্রমিত করার লক্ষ্যে আরো ৯টি বর্ণ সংযোজিত হয়। এভাবে মোট ২৭টি মূল বর্ণ নিয়ে গঠিত মণিপুরী বর্ণমালা মণিপুর অঞ্চলের সর্বত্র সমানভাবে প্রচলিত হতে থাকে। মণিপুরী লিপির উৎস নিয়েও বেশ বিতর্ক আছে। তবে সাধারণভাবে প্রচলিত মত হলো, এই লিপি ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত। বর্তমানে প্রচলিত মণিপুরী লিপির অনেক বর্ণের সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির সাযুজ্য স্পষ্ট লক্ষ্যযোগ্য। তবে মণিপুরী লিপিতে ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে অনেক স্থানীয় উপাদান বা বৈশিষ্ট্যও যুক্ত হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মণিপুরী বর্ণমালার এক অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো- এর প্রতিটি বর্ণমালার নামকরণ করা হয়েছে দেহের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামানুসারে এবং এর গঠনও সংশ্লিষ্ট ঐ অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের গঠন প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশপূর্ণ। যেমন- মণিপুরী বর্ণমালার প্রথম বর্ণ হলো 'কোক', যার অর্থ 'মাথা'; এই বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ হলো 'ক' এবং শব্দে যখন ব্যবহৃত হয় তখন এর উচ্চারণ হয় বাংলা 'ক' বর্ণের মতো। মণিপুরী বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণ 'সম', যার অর্থ 'চুল'; এর বাংলা প্রতিবর্ণ 'স' এবং শব্দে ব্যবহারের সময় এর উচ্চারণ হয় বাংলা 'স' এর মতো। একইভাবে মণিপুরী বর্ণমালার পরবর্তী বর্ণগুলো হলো- 'লাই' অর্থাৎ ললাট, 'মিৎ' অর্থাৎ 'চক্ষু' ইত্যাদি। মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামানুসারে মণিপুরী বর্ণমালার নামকরণ এক অনন্য নিদর্শন এবং সম্ভবত পৃথিবীতে নজিরবিহীন।

এ. কে. শেরাম

আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার অর্জনে গণপাঠশালা কার্যক্রম

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২০০১ সালে বান্দরবান জেলার প্রত্যন্ত উপজেলা থানচিতে প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সমন্বিতভাবে পরিচালনার জন্য গণপাঠশালা কার্যক্রম শুরু করে। শুরুর সময় দেখেছি, দুর্গম জনপদে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। বিদ্যালয়সমূহ সমতলের নকশায় নির্মিত, যা শিশুদের গৃহ পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুদের মনে প্রথমেই ভিন্নতার প্রশ্ন জেগেছে। এছাড়া শিক্ষকের ভাষা শিশুরা বুঝতে পারে না এবং শিশুদের ভাষাও শিক্ষক বোঝেন না। এই দ্বন্দ্ব থেকে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ অনুপস্থিতি বিদ্যালয়কে কাঠুরে ও গৃহপালিত পশুর নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র বানিয়েছিল।

গণপাঠশালা নির্মাণে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর গৃহনির্মাণ নকশাকে প্রাধান্য দিয়েছি। প্রথম থেকেই শিশুদের গৃহ পরিবেশ ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করার জন্য শতভাগ আদিবাসী নারী শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে কাজ করি।

শুরুর সময় থানছির নির্বাচিত দুর্গম পাড়া থেকে ৫০ জন কারবারী, হেডম্যান, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সমাজকর্মীদের রাজধানী ঢাকার পাশে সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে মতবিনিময় সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারা উপস্থিত হয়ে দুর্গম পাড়ায় আবাসিক নারী শিক্ষক নিয়োগ, তাদের নিরাপদ আবাসন এবং আহারের বিষয়ে সম্মতি জানান। পরবর্তী কালে তাদের সহযোগিতায় প্রথমে ৩০ জন এবং ক্রমান্বয়ে শতাধিক নারী শিক্ষক নিয়োগ এবং সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আবাসিক ব্যবস্থাপনায় ৬০ দিন প্রশিক্ষণ দিয়ে দুর্গম অঞ্চলে নির্ভীকভাবে কাজ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে পাঠানো হয়। প্রশিক্ষণে সঠিক পদ্ধতিতে পাঠদানের পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা, শরীরচর্চা, কুচকাওয়াজ, জাতীয় সংগীত, দেশাত্ববোধক গান শিখিয়ে সকল গণপাঠশালায় শিক্ষাদানে সমতা আনা হয়।

প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদে ম্রো, মারমা, বম, খুমী, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার জন্য পাড়াবাসী প্রতিটি গণপাঠশালার জন্য দুইজন নারী শিক্ষকের নিরাপদ আবাসনে গৃহনির্মাণ ও আহারের ব্যবস্থা করেছে। শিক্ষিকার গৃহে পৃথকভাবে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের বসার ব্যবস্থা, ঘুমাবার ও রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষিকাদের কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রী এবং পাড়াবাসীর মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

মাতৃভাষা শিক্ষার বিষয়টি অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, ম্রো জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে চতুর্থ বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হলেও বান্দরবান জেলার মধ্যে অক্ষর জ্ঞানে তারা ছিল পশ্চাৎপদ। ধর্মযাজক ম্যানলে ম্রো ক্রামা ১৯৮৫-'৮৬ সালে ম্রো ভাষার ৩১টি বর্ণমালা প্রবর্তন করেন। হাতে লিখে নিজস্ব বর্ণমালায় ধর্মীয় বই, কবিতা, ছড়া, গান ও নাটক প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে মালুমঘাট ক্রিশ্চিয়ান মেমোরিয়াল হাসপাতাল পরিচালিত বাংলাদেশ ট্রাইবাল এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ২০০০ সনে কম্পিউটার ফন্ট প্রস্তুত করা হয়। ম্রো ভাষা বর্ণমালা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কমিটি স্থানীয় পর্যায়ে চাঁদা সংগ্রহ করে ম্রো মাতৃভাষায় জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ১০টি বইয়ের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র দুই পর্যায়ে ২,০০০ সেট অর্থাৎ মোট ২০,০০০ বই মুদ্রণে সহযোগিতা দিয়ে ভাষা কমিটিকে উৎসাহিত করে।

শিক্ষক হিসাবে ৭০ জন নারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তারা সবাই ছিল মাতৃভাষার প্রথম শিক্ষার্থী। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তাদের আবাসিক ব্যবস্থাপনায় ছয় মাস বই পড়িয়ে-শিখিয়ে পাড়া পর্যায়ে গণপাঠশালাসমূহে পাঠায়। পরবর্তী চ্যালেঞ্জ ছিল শুধু মাতৃভাষায় শিক্ষা নিলে চলবে না, জাতীয় শিক্ষাক্রমের সঙ্গে তাদের সম্পর্কিত করতে হবে। তখন ঠিক হলো, প্রতিটি গ্রামে একজন এসএসসি বা নবম শ্রেণি পাস পর্যায়ের শিক্ষিকা নিয়োগ দিয়ে একই সঙ্গে মাতৃভাষা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণে দুই ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা। এভাবে দুই ধরনের শিক্ষার সংযোগের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শেখানো ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তোলার ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। এভাবে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখে। উল্লেখ্য, বান্দরবান জেলায় ৩টি ম্রো আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে ম্রো শিক্ষক না থাকায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা ছিল নগণ্য। বর্তমানে সেখানে ভর্তি প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

দুর্গম অঞ্চলে শিশুরা পাড়া পর্যায়ে কমিউনিটি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারে। এজন্য কোনো স্কুলঘর নির্মাণের প্রয়োজন নেই। চতুর্থ শ্রেণি থেকে উচ্চ পর্যায়ে পড়াশোনা করাতে গেলে সব জায়গায় দক্ষ শিক্ষক পাওয়া যাবে না। দক্ষ শিক্ষক একমাত্র ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে তখন প্রশ্ন আসবে ছাত্রাবাসের। যদি খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা অথবা উপবৃত্তির পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে অথবা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য ১০০% উপবৃত্তি মঞ্জুর করা গেলে প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদের অন্ধকার সমাজ আলোকিত হয়ে উঠবে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষমাত্রা দ্রুত অর্জন করা সম্ভব হবে। এসব এলাকার ছেলে-মেয়েদের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রস্ক (ROSC) প্রকল্পের দু'জন শিক্ষক নিয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা ও সহযোগিতা করলে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণ হবে। এজন্য সরকারকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

গোলাম মোস্তফা দুলাল

ভাষাসৈনিক উ সুয়ে হাওলাদার

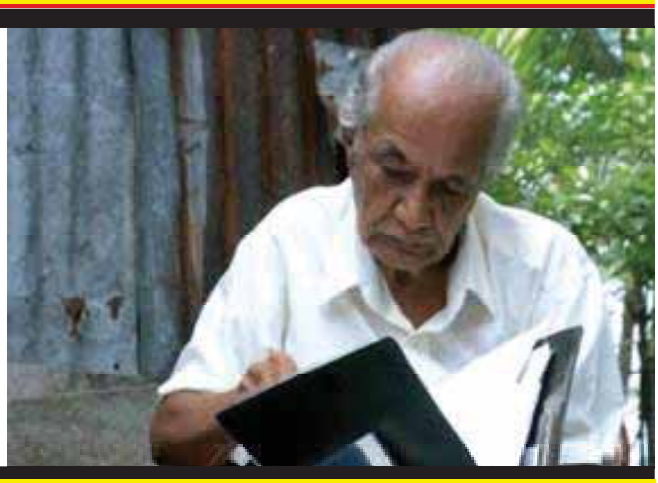

‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, দিতে হবে দিতে হবে’-এমন দাবি নিয়ে বাংলা ভাষার জন্য রাজপথে নেমেছিলাম, মিছিলে মিছিলে আন্দোলন জমিয়ে তুলেছিলাম বৃহত্তর বরিশালে। ভাষা আন্দোলনের জন্য মানুষকে সোচ্চার করতে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়েছি। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বাধার সম্মুখীন হলেও স্কুল পালিয়ে মিছিলে নেমেছি। সেদিন ভেবেছিলাম বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আমাদের ভাষাও (রাখাইন) প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। কোনো বৈষম্য ছাড়াই বাঙালিদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারব। কিন্তু ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ তো দূরের কথা, আমরাই অস্তিত্ব সংকটে পড়ে গেছি।’ এক নিঃশ্বাসে আফসোসের সঙ্গে কথাগুলো বলে ফেলেন রাখাইন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সংগ্রামরত ভাষাসৈনিক উ সুয়ে হাওলাদার।

‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ দাবিতে মিছিলে ১৮ বছর বয়সে যোগ দেন উ সুয়ে হাওলাদার। আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে রাখাইন সম্প্রদায় উন্নতির সোপানে পা রাখতে পারবে, এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরেও এই স্বপ্ন যেন স্বপ্নই রয়ে গেল। পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ৮২ বছর বয়সী এই ভাষাসৈনিক ভারাক্রান্ত মনে স্বপ্ন ও আফসোসের কথাগুলোই বললেন।

কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা জানতে চাইলে ভাষাসৈনিক উ সুয়ে বলেন, আমি ভাষা আন্দোলনের আগে থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ১৯৫৭ সালে বরিশাল জেলায় আব্দুর রব সেরনিয়াবাদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, এটা একটি প্রগতিশীল দল, মেহনতি মানুষের দল। এজন্য অন্য বন্ধুদের সঙ্গে তাদের (ন্যাপ) পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ১৯৭০ সালের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে অংশ নিয়েছি। ন্যাপের পক্ষ থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। সে সময় ওয়ালি খান, তার গ্রুপের প্রফেসর মোজাফ্ফর, পঙ্কজ ভট্টাচার্যও ছিলেন ন্যাপে। আমি তখন কুঁড়েঘরের পক্ষে নির্বাচনে অংশ নিয়েছি।

রাখাইনদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ কী? উ সুয়ে মনে করেন, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মের বিষয়ে আমরা একটু আলাদা। আমাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান একটু ভিন্ন। এগুলোতে যদি কোনো আঘাত আসে সেখানে থাকতে পারি না। অনেকে মগ বলে উপহাস করে আমাদের। এসব কারণেই আমাদের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় চলে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকেই আমাদের জন্য ‘বেঙ্গল টেনেনসি অ্যাক্ট’ নামে একটা ভিন্ন আইন আছে। এটা স্পেশালি সমতলের আদিবাসীদের জন্য। এটি অনুসারে আইন প্রযোজ্য হচ্ছে না।

এটি না হলে আমরা আর এখানে থাকতে পারব না। আমাদের মন্দির, শ্মশানের জায়গাগুলো বড় বড় প্রতিষ্ঠান লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কোনো শ্মশান নাই। ভুয়া দলিল করে অনেকেই আমাদের জমি-জমা দখল করে নিয়েছে। আমরা খুব কষ্টে আছি। আদিবাসীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে কিয়াং, ইন্দিরা এগুলো পুনঃরুদ্ধার করতে হবে।

শেখ জাহাঙ্গীর আলম

এমএলই শিখন-শেখানো উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা

৮-১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে ঢাকায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর আয়োজনে ও এমএলই ফোরামের সহযোগিতায় গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কক্ষে এমএলই শিখন-শেখানো উপকরণ উন্নয়ন বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালায় চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদরি ও গারো ভাষার ২৫ জন লেখক অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার উদ্বোধনীপর্বে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল, আলোচক হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান সরকার। এমএলই উপকরণ উন্নয়ন শীর্ষক উপস্থাপনা ও কর্মশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সমগ্র ওরিয়েন্টেশনটি পরিচালনা করেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ মুরশীদ আকতার।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা ফোরামের সচিব ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ, আগা খান ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ডা. গোলাম মোস্তফা, সেভ দ্য চিলড্রেনের প্রকল্প পরিচালক মেহেরুন্নাহার স্বপ্না প্রমুখ।

কর্মশালায় এমএলই শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল ২২-৩১ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১০ দিনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এমএলই উপকরণ উন্নয়ন করবেন।

সোবহানা আলম

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার **পহর** প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত **গণসাক্ষরতা অভিযান**-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org